Re. 2.00

মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

14th October 2017

মাসিক

Vol : VI Issue : VII, 14th October, 2017 আশ্বিন, ১৪২৪, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

শুভ বিজয়া ও দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

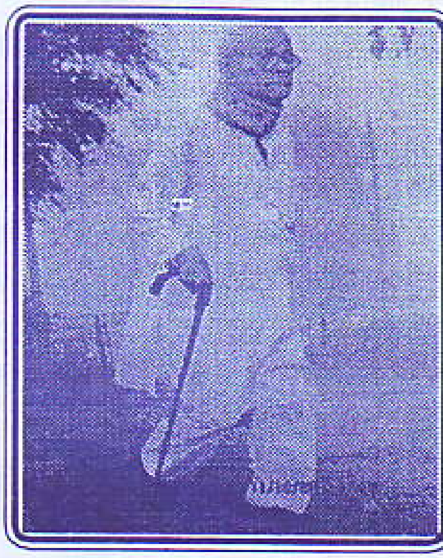

১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবসে প্রবীণদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা

-ঃঃ বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস ও শারদীয়া মিলনোৎসব উপলক্ষে সভাপতির প্রতিজ্ঞা ঃঃ-

পেলব মুখার্জী

সারা বিশ্বে প্রবীণ নাগরিক দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। আমরাও শারদীয়া মিলনোৎসব পালন করার সাথে সাথে ঐদিন পালন করছি শারদীয়া মিলনোৎসবের আসরে একই মঞ্চে।

আমাদের দেশের অবস্থা খুবই করুণ বলা যায় খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য তো বটেই তার সাথে যুক্ত করা যায় উন্নত দেশগুলির চোখ ধাঁধানো উন্নতি যা আমাদের কল্পনা করা তো দূরের কথা মনে হবে যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলছি। আমাদের দেশের আনুমানিক ২৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে এবং অর্ধ অনাহার আর অসুস্থতার শিকার। নানা সরকারি প্রকল্প আছে যেমন রেলের ভাড়া, বাসে বা ট্রামে বয়স্কদের বসার জন্য আসন, বার্ধক্য ভাতা বরাদ্দ ইত্যাদি জনমোহিনি প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু সুযোগ চুঁইয়ে চুঁইয়ে গরীব মানুষের কাছে পৌঁছায় তার বেশী কিছু নয়। এসব প্রকল্পের কথা ১২৫ কোটি দেশের লোকের মধ্যে কজন জানে বা বোঝে তা বলতে পারবো না। সরকার থেকে বয়স্কদের সুরক্ষার জন্য প্রতি থানায় 'প্রণাম' নামক সংগঠন আছে তাদের কাছে কতজন পৌঁছাচ্ছে সেটা বড় কথা নয় তারা কি কি সুযোগ পেতে পারে তা কজন জানে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও আছে তা কি হাল হকিকৎ সবটা জানিনা তবে এক দুঃসহ অবস্থায় গরীব মানুষ আছেন একথা সহজেই বলা যায়।

গরীব নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের কথা ভেবেই আমাদের এই সংগঠন ১২ বছর ধরে কাজ করছে। কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা আর আলোচনা সভার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি বয়স্কদের একত্রিত করে তাদের সমস্যা দূর করতে এই কাজে যুবকদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি। কিন্তু যে সাহায্য পাচ্ছি তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য বলা যায়। তবে আমরা আশা হত হচ্ছি না আমাদের এই প্রচেষ্টা একদিন না একদিন সফল হবেই এই ভাবনা নিয়ে চলার চেষ্টায় আছি।

শারদীয়া মিলনোৎসব চালু হয়েছিল জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়নের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তার সাথে বেথুন ইন্সটিটিউট যুক্ত হয়ে আজকের এই সমাবেশ পালিত হচ্ছে গত ১২ বছর ধরে। এই দুঃখের মধ্যে অন্তত ১দিন জড়ো হই সুখ দুঃখ বেদনার বিনিময়ে জন্যই। এই মিলনোৎসব সকলের প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলেছে। সব দুঃখ বেদনার অবসান ঘটিয়ে, এক সুখি জীবনের লক্ষ্যে। আজকের শুভদিনে আপনাদের অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি পালন করার ব্রত নিয়ে। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

Vol : VI Issue : VII,14th October, 2017 আশ্বিন, ১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

-ঃঃ কমরেড অম্বর রায়চৌধুরী স্মরণে ঃঃ-

জন্ম ঃ ১৫ই মার্চ, ১৯৪১
মৃত্যু ঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭

৪ঠা অক্টোবর, ২০১৭ কমরেড অম্বর রায়চৌধুরী স্মরণে —

- জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

- বেথুন ইন্সটিটিউট অফ্ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার।

- জয় ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্মীবৃন্দ কর্তৃক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় যৌথভাবে নিম্ন বর্ণিত শোক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে।

কমঃ অম্বর রায়চৌধুরী-এর স্মরণে শোকপ্রস্তাব

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ রবিবার বেলা ২.১৫ মিনিটে শ্রমিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা কমরেড অম্বর রায়চৌধুরীর জীবনাবসান ঘটে তাঁর নিজ বাসভবনে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তাঁর মৃত্যুতে একজন প্রবীণ রাজনৈতিক মানুষের অভাব আমরা বোধ করছি। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী, কন্যা, ভাই, বোনেদের সাথে অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। কমঃ অম্বরের মৃত্যুতে দেশবাসী হারালো একজন সাহসী সমাজসেবীকে যিনি আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। ১৯৮৫ সালে তাঁর জিহ্বায় ক্যান্সার রোগ ধরা পরে ও তার চিকিৎসাও হয়। তারপর সবাই ভেবে নিয়েছিলাম আর ভয় নেই। কিন্তু ২০১৬-র প্রথমদিকে পুনরায় রক্তজনিত ক্যান্সর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন থেকেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, রবিবার দুপুরে দীর্ঘ লড়াই শেষ হয়ে গেল।

শ্রমিক আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলন, বস্তি আন্দোলন শুধু নয় সাধারণ মানুষের বিপদে - আপদে তাদের পাশে তিনি দাঁড়াতেন নিঃস্বার্থভাবে। বন্যাপীড়িত মানুষদের সেবা কাজে আমরা দেখেছি অম্বরের ভূমিকা। জয়া কারখানার ধর্মঘট সংগ্রাম, বেঙ্গল ল্যাম্পের মালিকের অত্যাচার জর্জরিত শ্রমিকদের পাশে অম্বর সজাগভাবে অংশগ্রহণ করতেন। বয়স্ক লোকেদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সমস্যা দূর করার কাজে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল নজর কাড়া।

৩৫ বছর একটানা সি.পি.আই (এম) দলের আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করে গেছেন। তার সাথে কলোনি কমিটি, বস্তি কমিটি, ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগিদার হয়ে উঠেছিলেন অম্বর। পৌর নির্বাচনে প্রার্থী হয়েও পরাজিত হন। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে অত্যাচারিত হতে হয়েছে বারে বারে কিন্তু তাতেও তাঁকে নিরস্ত করা যায়নি, তাঁর সেবার লক্ষ্যে অবিচল পথ চলায়।

অদ্যকার এই যুক্ত সভা কমঃ অম্বর রায়চৌধুরীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে। তাঁর পরিবার পরিজনসহ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে শোক জ্ঞাপন করছে।

কমঃ অম্বর রায়চৌধুরী অমর রহে।

Vol : VI Issue : VII,14th October, 2017 আশ্বিন, ১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

-ঃঃ বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে যাঁদের সম্মাননা জানানো হবে ঃঃ-

আশীষ সান্যাল - বিশিষ্ট কবি ও লেখক

সমকালীন সাহিত্যজগতে আশীষ সান্যাল একটি স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত নাম। কবি হিসেবে তিনি পরিচিত হলেও ছোটগল্পকার, শিশুসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদক হিসেবেও খ্যাত। সাহিত্য রচনা করতে বসে তিনি কখনও তারল্যকে প্রশ্রয় দেননি। আবেগের স্রোতে গা-ভাসিয়ে না- দিয়ে তিনি উপলব্ধ বিষয়ের কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান।

সাহিত্য যে সাহিত্যিকের জীবনবেদ, জীবনদর্শন এ-কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাই তাঁর সাহিত্যে একটি ভিন্ন মাত্রা পাওয়া যায়। আশীষ সান্যালের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার সুসং দুর্গাপুর গ্রামে ১৯৩৮ সালে। দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে চলে আসেন ভারতে। শুরু হয় এক নতুন জীবন-সংগ্রাম। লেখক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ছয়ের দশকের প্রথমদিকে। সেই থেকে নিরলস লিখে চলেছেন তিনি। বহু আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন তিনি।

সাহিত্য সংগঠক হিসেবেও আশীষ সান্যাল বিশেষ পরিচিত। এখন পর্যন্ত তাঁর ১১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৩৯। 'ভূয়ালকা পুরস্কার', 'দিশারী পুরস্কার' সহ বহু পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ কর্তৃক 'সাহিত্য মহোপাধ্যায়' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে পেয়েছেন 'জাতীয় কবির' সম্মান। স্বদেশ ও বিদেশের লেখকদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি খুবই গুরুত্ব দেন।

আজ তাকে সম্মাননা প্রদান করতে পেরে আমরা ধন্য।

-ঃঃ শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃঃ-

বিশিষ্ট লোকগীতি শিল্পী

লোকসঙ্গীতে বহু শিল্পীকে আমরা পেয়েছি, গীতা চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে গায়িকাদের মধ্যে গীতা চৌধুরীর সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর।

অসাধারণ লোকগীতি গায়িকা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ লোকগীতি গায়িকারূপে পরিচিত। তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা লোকসঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী প্রয়াত নির্মলেন্দু চৌধুরীর কাছে। তাছাড়াও তিনি শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর অনুজ বিশিষ্ট শিল্পী নীরেন্দ্র চৌধুরী সহধর্মিনী।

আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের নিয়মিত শিল্পী শ্রীমতি গীতা চৌধুরী বহু সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছেন। ভারত সরকার তাঁকে সাংস্কৃতিক বৃত্তি প্রদান করেন। সঙ্গীতগুরু প্রয়াত নির্মলেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায় লোকপালা মলুয়া-তে নায়িকার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সকলের মন জয় করেছিল। **Times of India**, আনন্দবাজার সহ বিভিন্ন পত্রিকা **HMV, Hindustan Record Co.** সহ অসংখ্য বিখ্যাত সঙ্গীত ভবন থেকে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন গানের disc শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরীর সঙ্গীতের মুগ্ধ শ্রোতারা বর্হিভারতেও ছড়িয়ে রয়েছেন। প্রয়াত নির্মলেন্দু চৌধুরীর দলের প্রধান গায়িকা হিসাবে তিনি ব্রিটেন, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, রাশিয়া, রোমানিয়া, পূর্বতন যুগশ্লাভিয়া সহ অসংখ্য পূর্ব ইউরোপের দেশ, জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর সঙ্গীতে সেইসব দেশের শ্রোতৃমন্ডলী এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেছেন। তারা প্রকৃত লোকসঙ্গীতের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

লোকসঙ্গীত থেকে অন্যান্য সঙ্গীতের উৎপত্তি। আমাদের সকল কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতের আধার লোকসঙ্গীত। এ যেন আমাদের মায়ের মত। বাংলার মহিলা-লোকশিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতি গীতা চৌধুরী অন্যতম। আজ তাঁকে সম্মাননা প্রদান করতে পেরে আমরা ধন্য।

Vol : VI Issue : VII,14th October, 2017 আশ্বিন, ১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

-ঃঃ বিবেকানন্দ ও দীনদয়াল ঃঃ-

রামরমণ ভট্টাচার্য

সম্প্রতি বিজেপি' এর উদ্যোগে, দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং বিবেকানন্দকে একাসনে বসিয়ে তাঁদের বন্দনার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য এই দুজন আধুনিক যুগে হিন্দু ভারত নির্মাণের তথা হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পথিকৃৎ।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দীনদয়ালের তুলনা করার মানসিকতার অন্তরালে আছে চরম অজ্ঞতা, ইতিহাসের বিকৃতি এবং দূরভিসন্ধী। এই তুলনা চন্দ্রের সঙ্গে বান্দরের বা বাঁদরের মতো দুজনের সঙ্গে সাদৃশ্য। কেবল বিঁন্দুর - দুজনেই প্রয়াত।

এই লেখা উভয়কে নিয়ে কোনো তুলনামূলক আলোচনা নয়। এ কাজ অত্যন্ত অপরাধ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে না। তাই বিবেকানন্দ ও দীনদয়াল এর জীবন দর্শন, উভয়ের সাধনা ও সংগ্রাম তাঁদের লিখিত এবং মুদ্রিত রচনা থেকে উদ্ধৃতি হিসেবে কিছু ভাবনা তুলে দেওয়া হলো - সিদ্ধান্ত নেবেন পাঠক।

দীনদয়াল প্রচার করেছেন 'হিন্দু ধর্ম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং প্রাচীনতম ধর্ম'।

বিবেকানন্দ বলেছেন 'সকল ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং সমান; সর্ব ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধনা। দীনদয়াল প্রচার করেছেন হিন্দু কেবল ধর্ম নয়, হিন্দু একটি জাতি। হিন্দুরাই ভারতের আদিবাসী। অন্যরা পরে এসেছে তারা সকলেই অহিন্দু।

বিবেকানন্দ বলেছেন হিন্দু ধর্মে অনেক সম্প্রদায় আছে যেমন শৈব, জৈন, শাক্ত, লিঙ্গায়েৎ ইত্যাদি। এই ধর্মে একেশ্বরবাদী মানুষ আছে, বহু ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক উপাসক আছে। বহুজাতি এবং বহু ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনের পরিনামে গড়ে উঠেছে বর্তমান হিন্দু ভারত ও হিন্দু সংস্কৃতি।

দীনদয়াল চেয়েছেন মুসলমানরা হিন্দু ধর্ম মেনে নিয়ে ভারতবর্ষে থাকুক। অথবা এদেশ ছেড়ে চলে যাক কারণ তারা বিদেশী এবং বিধর্মী।

বিবেকানন্দ বলছেন, এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদ করে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহা মহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠেছে',। .... বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হোক না কেন, ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক।

দীনদয়াল বলেছেন, 'শূদ্ররা ঈশ্বরের পদতল থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ধর্ম উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করা - পা যেমন সমস্ত শরীরের ভার বহন করে। এই সত্য বৈদিক ঋষিরা বলেছেন (ঋগ্বেদ সংহিতায় পুরুষসূক্তের দ্বাদশ ঋক) গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, চাতুবর্ণ্য ময়া সৃষ্টং বিভাগশঃ বর্ণচতুষ্টয় গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি সৃষ্টি করিয়াছি - জ্ঞান যোগঃ শ্লোক ১৩ সুতরাং ভারতীয় সমাজের বর্ণবিভাজন যারা মানে না তারা ধর্মদ্রোহী।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যাদের শারীরিক শ্রমের ওপর নির্ভর করে ব্রাহ্মণের প্রভাব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা ও বৈশ্যের সম্পদ সম্ভব হয়েছে তারা কোথায়? সব দেশে সব যুগে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'নীচু জাতি' 'অন্তজ' অথচ তারাই হলো আসলে সমাজের শরীর, তাদের ইতিহাসটা কী? বিজ্ঞানের ভান্ডারে একটু ভাগ বসাবার অপরাধে ভারতবর্ষে যাদের জন্য জিহ্বা ও মাংস উপড়ে নেওয়ার মতো কোমল শাস্তি বিধান করা হয়েছে ভারতের সেই চলন্ত শবগুলি, বিশেষ সেই ভারবাহী পশুগুলি, সেই শূদ্র জনসাধারণ তাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে? (বর্তমান ভারত)। মানুষকে যারা অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করাকে পবিত্র ধর্ম বিশ্বাস বলেছেন বিবেকানন্দ তাদেরকে 'মানব বিদ্বেষী' বলেছেন (বর্তমান ভারত)।

দীনদয়াল বলেছেন মনুর সংবিধান শূদ্রের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। মনুর বিধান শূদ্র ধনসঞ্চয় করলে, শূদ্র জ্ঞানার্জন করলে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। মনুর মতো সমাজ তাত্বিক এবং শঙ্কর আচার্যের মতো দার্শনিক বলেছেন শূদ্রের আত্মা নেই তাই তাদের মুক্তিও নেই তারা পশুবৎ'

বিবেকানন্দ বলছেন, 'সর্বভুতে ঈশ্বর বর্তমান মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের সন্তান।' তিনি বলেছেন, 'মনু, রামানুজ, শঙ্কর ইঁহারা ছিলেন পন্ডিতমাত্র কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় ছিল অতি সংকীর্ণ। সব মানুষই এক - এটাই হিন্দু ধর্মের বড় শিক্ষা।

দীন দয়াল বলছেন, 'সমাজতন্ত্রের দর্শন ভারতবর্ষে অচল। যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে তারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দালাল।

বিবেকানন্দ বলছেন 'আমি সমাজতন্ত্রী, কারণ এই নয় যে সমাজতন্ত্রকে আমি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা বলে মনে করি, কারণটা এই যে উপবাস করার চেয়ে আধখানা রুটি মেলাও ভাল। ... সে যাই হোক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য- এই তিন শ্রেণীর শাসনের পালা শেষ হয়েছে এবার শেষের 'টির পালা। এবার শূদ্র, আসবেই আসবে, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না।'

দীনদয়াল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অন্যান্য নেতা হেডগেওয়ার, গোল ওয়ালকর প্রমুখ সকলেই নারী শিক্ষা এবং নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। তাঁর বিশ্বাস করেন নারী নরকের দ্বার, নারী পুরুষকে বিপথগামী করে, সাধনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। শঙ্করাচার্য তো অষ্টম শতাব্দীতেই বলেছেন নারীও শূদ্রের মতো আত্মাহীন। সুতরাং নারীসংগ ত্যাগ করা সাধকের প্রাথমিক সাধনা। শূদ্রের প্রয়োজন শ্রমের জন্য, নারীর প্রয়োজন কেবল সন্তান ধারণ ও পালনের জন্য। তাঁরা বিংশ শতাব্দীতে সোচ্চারে লেখেন ও বলেন "পাশ্চাত্যের অনুকরণে নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার দাবী ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিপন্থী"। তাঁরা বলেন, "মেয়েদের স্বাধীনতা দেবার ফলে প্রতি পরিবারে বিরোধ বাড়ছে। মেয়েরা বেশী অধিকার পাবার ফলেই একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে (আবাঞ্চ অব অথটস্ গোলওয়ালকর)। বিংশ শতাব্দীর শেষেও তারা সতীদাহ প্রথার জয়গান করে এবং সতীদাহ করার জন্য বি.জে.পি. সরকার সমর্থন করে- স্মরণীয় আশীর দশকে রাজস্থানে সংগঠিত ভাবে রূপ কানোয়ার হত্যার ঘটনা।

বিবেকানন্দ বলেছেন, নারী আদি শক্তি, নারীকে বিযুক্ত করে কোনো দেশে কোনো সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি হতে পারে না। বর্তমান ভারতবর্ষে, "নারী জাতিকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত করে তুলতে পারিনি সেই হেতু তাদের সমালোচনা করাও আমাদের উচিত নয়। মেয়েরা যাতে তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে সেই অবস্থায় তাকে পৌছোতে হবে। ... পৃথিবীর অন্য দেশের মেয়েরা যা পারে আমাদের মেয়েরাও তা পারবে"(ভারতীয় নারীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত)।

উনি বলেন - ওঁরা বলেন এক ধর্ম, এক ভাষা, এক রাষ্ট্র; হিন্দি এবং হিন্দুস্তান, ওঁরা বলেন সহিষ্ণুতা আসলে কাপুরুষের ধর্ম, দুর্বলের যুক্তি। আমার দেশে আমার সংস্কৃতি, আমার ঐতিহ্য, আমার রীতি-নীতি ছাড়া অন্য সব কিছু অবাঞ্ছিত, আবর্জনা। আবর্জনাকে নির্মমভাবে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। আসলে ওঁরা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় হলেও খ্রিষ্টান এবং প্রধানত মুসলমান এবং কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী। যেভাবেই হোক ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং যুক্তিবাদী তথা বস্তুবাদী চিন্তাচেতনা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে হবে। ইসলামের মানবিক সমাজবন্ধন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ হিন্দু মৌলবাদের কাছে প্রধান বিপদ।

আর বিবেকানন্দ বলছেন ঃ " গোষ্ঠী চেতনার প্রাক্কালে মানুষের মনে প্রেমের ভাগ ছিল সামান্য পরস্পরের প্রতি কর্তব্য চেতনাও ছিল যৎকিঞ্চিৎ এবং সমাজ বন্ধনও ছিল শিথিল। স্বভাবতই মানুষ ক্রমে ভাবতে শিখল; ক্ষতি অথবা ত্যাগস্বীকার না করেও কিভাবে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি। ... এই অসম্ভবের ধারণা থেকেই মানুষের ভেতরে এসেছে সংযম। মানব সমাজ গঠনের মৌলিক ভিত্তিই হল আত্ম সংযম। এখন আমরা সকলেই জানি, যে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক, সংযম ও সহনশীলতার শিক্ষাটি যার হয়নি তার জীবন নিতান্তই দুর্বহ।

ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যাপারগুলি খুবই কঠোর কিন্তু ধর্মমতের ব্যাপারে সেখানে অবাধ স্বাধীনতা.. কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্মের ক্ষেত্রে আসুন; বিভিন্ন আচার ব্যবহার, মতাদর্শ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বরকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা সব কিছুই রয়েছে এক সহাবস্থানের মধ্যে ...

'ভারতবর্ষে আছেন চার্বাক পন্থীরা'। উনবিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদী দার্শনিকরাও যে তত্ত্ব প্রকাশ্যে বলতে সাহস পাননি সেই নিরাবরণ বস্তুবাদী তত্ত্বকে চার্বাক পন্থীরা প্রচার করেছেন খোলাখুলি ভাবে। ধর্ম যে সর্বৈব উন্মাদের প্রলাপ, পুরোহিততন্ত্র যে দুষ্ট লোকের দানবীয় কৌশল, বেদ সমূহ যে মুর্খদের লেখা কিছু শব্দ সমষ্টি মাত্র এবং ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্ব বলে যে কিছুই নেই - এ সব কথা চার্বাকবাদীরা মন্দিরে মন্দিরে, নগরে নগরে প্রচার করেছেন ধর্মমত্রে স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারতের এই মহান উদারতা চিরকালই ছিল। এ স্বাধীনতা যদি দিতে না পারেন তাহলে সমৃদ্ধিও কোথাও আসবে না। ...

ভারতবর্ষে আমরা আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। তার ফলে ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে লাভ করেছি বিপুল সুফল যা আজও বর্ধনশীল'' (জ্ঞানযোগ)।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আজ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। কয়েকহাজার বছরের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সন্ধানের সাধনা এবং সেই ঐতিহ্য আজ ধ্বংস হচ্ছে। একটি হিন্দু মৌলবাদী দল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। এই দলটির অর্থনৈতিক দর্শন ধনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক দর্শন ফ্যাসিবাদী এবং সমাজ ভাবনায় প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক। দলটির এইসব দর্শনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা দীনদয়াল উপাধ্যায় — তিনি একশোভাগ রাজনৈতিক ব্যক্তি। বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক। বিবেকানন্দের কর্মজীবনের। সময় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বিবেকানন্দ সেই দলের বিরোধিতা করেন নি অন্যদিকে একদিনের জন্যও এই প্রতিষ্ঠানে যাননি। তাঁর বিপুল রচনায় কোথাও ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি শব্দও লেখা নেই - তিনি প্রায় সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন বেদান্ত ধর্মের ইতিবাচক সম্পদগুলির সঙ্গে বিশ্ববাসীর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। তাঁর সাধনা ও সংগ্রাম ছিল বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা - 'বিশ্বধর্মের' প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর উদাত্ত ঘোষণা; ''অতীতের সমস্ত ধর্মকেই আমি গ্রহণ এবং উপাসনা করব। ঈশ্বরকে যেভাবেই উপাসনা করুন না কেন প্রত্যেক ধর্মের মানুষের সঙ্গে ই আমি উপাসনায় বসব' মুসলমানদের সঙ্গে মসজিদে যাব, খ্রিস্টানদের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তির সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করব। বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ভগবান তথাগতের স্মরণ নেবো, গ্রহণ করব তার নীতিকে আর হিন্দুর সঙ্গে অরণ্যের গভীরে গিয়ে ধ্যানে বসে ... সেই আলোকের সন্মান করব।'

"হিন্দু মনে করে ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন — এই চিন্তাই অর্থহীন, ঈশ্বরের স্বর্গবাসাদি এবং চিন্তাই মানবিক গুণাবলীর আরোপ মাত্র। স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে কোথাও তাহলে তা এই মুহূর্তে এখানেই পাওয়া যাবে" (বিশ্বধর্মের পথ)।

অখন্ড মানবপ্রেম, দেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের ত্রিবেণী সঙ্গমের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। পরধর্ম বিদ্বেষী, বর্ণ বিদ্বেষী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের নাম দীনদয়াল উপাধ্যায়।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের দুটি ধারা। একটি ধারার নাম যুক্তিবাদ অন্যটির নাম মানবপ্রেমী ভক্তিবাদ। বিবেকানন্দ দ্বিতীয় ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি একটি যুগের ফসল। স্বভাবতই তাঁর যুগের ইতি-নিতি তাঁর কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। কোনো মানুষই যুগনিরপেক্ষ হতে পারেন না। বিবেকানন্দের কর্মে, চিন্তায় ভাবনায় অপূর্ণতা থাকতে পারে। রাষ্ট্র গঠন করে সেই রাষ্ট্রের উদ্যোগে নয়, একান্তভাবে সামাজিক উদ্যোগে। তিনি অসম্পূর্ণ মানুষকে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'। এই মিশনের শিক্ষায় গড়ে উঠবে চরিত্রবান, নির্লোভ, সৎ, মানবপ্রেমিক দেশপ্রেমিক এবং বিশ্বপ্রেমিক উন্নত নৈতিকতায় সমৃদ্ধ নতুন মানুষ। সেই মানুষই আনতে পারে ভারতবাসীর জন্য প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এতবড় একটা দেশে এত বহুত্বের মধ্যে এই ধরণের মানুষ নির্মাণের জন্য রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ভাবে কেবলমাত্র কয়েকজন সর্বত্যাগী মিশনারীর উদ্যোগ কি সাফল্য লাভ করতে পারে! সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ থাকবে, চরম দুর্নীতি গ্রস্ত উচ্চবর্ণের বিত্তবান মানুষরা থাকবে, অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্ত 'বিশকোটি চলমান শব' থাকবে যেখানে সেখানে, কি মানব পদ্ম ফোটান সম্ভব!

প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু প্রশ্ন নেই বিবেকানন্দের সততা ও আন্তরিকতায়।
আমরা তাই ধিক্কার জানাই এই দুজনকে একাসনে বসাবার দুরভিসন্ধিকে।

—

Vol : VI Issue : VII,14th October, 2017 আশ্বিন, ১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

-ঃঃ ইনহেলার বরং ভাল ঃঃ-

ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত

শ্বাসকষ্টজনিত রোগে বহু মানুষকে ভুগতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে বারবার কষ্ট হলে তাকে চলিত কথায় বলা হয় হাঁপানি। এই রোগে শ্বাসনালীর অতি-সক্রিয়তার দরুন নালীর সংকোচন হয়, ফলে বাতাস চলাচলের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন অক্সিজেনের অভাব হয়, রোগী শ্বাসকষ্ট অনুভব করে। শ্বাসনালীর অতি সক্রিয়তার ফলে নালীতে প্রদাহ হয়, ফুলে যায়, নালীর পেশীর সংকোচন হয়, এবং নালীর ভিতরে রসালো পদার্থ জমতে থাকে। এই অতি-সক্রিয়তার অনেক কারণ আছে। যেমন, জীবানু আক্রমণ, অ্যালার্জি ইত্যাদি। অ্যালার্জি হতে পারে বাইরের কিছু জিনিস যেমন ধুলো, অতিক্ষুদ্র পোকা-র জন্য, শরীরের আভ্যন্তরীণ কারণ যেমন, ইমিউনোগ্লোবিউলিন সমস্যার জন্য। এমনকি পেটে কৃমি থেকেও হতে পারে।

শ্বাসকষ্টের চিকিৎসার লক্ষ্যই হল শ্বাসনালীর বায়ু চলাচলের পথকে প্রশস্ত করা। নানা রকমের ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। জীবানুর আক্রমণ হলে জীবানুনাশক ওষুধ দিতে হবে। অ্যালার্জি যাতে কমানো যায় তার ওষুধ দিতে হবে। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন হয় শ্বাসনালীর পথকে প্রশস্ত করা। তার জন্য কয়েকরকমের ওষুধ দিতে হয়। এক ধরনের ওষুধ নালীর প্রদাহ কমায়, আরেক ধরনের ওষুধ নালীর পেশীর সংকোচন কমিয়ে নালীর পথ খুলে দেয়। কিছু ওষুধ আবার জমে থাকা তরলকে পাতলা করে।

সাধারণভাবে মানুষের শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় নানা উপায়ে। যেমন, মুখে খাইয়ে, মাংশপেশি বা শিরার মধ্যে ইঞ্জেকশান দিয়ে, কখনো চামড়ার উপর প্রলেপ লাগিয়ে (যেমন জেল), চোখে বা কান বা নাকে ড্রপ আকারে, জিভের তলায় রেখে, মলদ্বারের মধ্যে ইত্যাদি।

শ্বাসতন্ত্রের জন্য যে আধুনিক পদ্ধতি নেওয়া হয় তাকে বলা হয় ইনহেলার। চলিত কথায় পাম্প। ইনহেলারের মাধ্যমে প্রদাহ কমানো বা পেশির সংকোচন কমানোর ওষুধকে সরাসরি শ্বাসতন্ত্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। এর সুবিধা হল-যেটুকু ওষুধ প্রয়োজনের শুধু সেটুকু ওষুধ প্রয়োগ করলেই চলে, এবং যেখানে প্রয়োজন শুধু সেখানেই ওষুধ প্রয়োগ করা যায়।

ইনহেলার নিতে অনেকের অনীহা আছে। নতুন জিনিস বলে ভয় আছে, ভুল ধারণাও আছে। যেমন, লোকে ভাবে যে একবার ইনহেলার নিলে অন্য ওষুধে আর কাজ হবে না। এই ধারণা একেবারেই ভুল। প্রদাহ কমানোর ওষুধ হল এক ধরনের স্টেরয়েড। খুব কার্যকরী। এই স্টেরয়েড মুখে খাওয়ালে তা পেটের অন্ত্র থেকে শোষিত হয়ে রক্তে মিশবে, সেখান থেকে লিভার হয়ে হার্টের মাধ্যমে সারা শরীরে

ছড়াবে। যেটুকু শ্বাসতন্ত্রে যাবে শুধু সেটুকুই কাজে লাগবে। বাকি অংশ প্রস্রাব ইত্যাদির মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে। উপরন্তু, শরীরের অন্য অংশে বিরূপ ক্রিয়া হতেও পারে। তাই ইনহেলারের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করা শরীরের পক্ষে বেশি স্বাস্থ্যকর। ইনহেলারে যে স্টেরয়েড দেওয়া হয় তার মাত্রা অনেক কম বলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুবই কম হয়, অথচ রোগী কষ্টমুক্ত থাকে। মনে রাখতে হবে ইনহেলার হল আরো আধুনিক ভাল পদ্ধতি।

ভবিষ্যতে মানুষের ওপর ওষুধ প্রয়োগ আরো নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী করা হবে, শরীরের যেখানে প্রয়োজন তার বাইরে ওষুধ প্রয়োগ করা হবে না।

—ঃঃ কেষ্টখুড়োর জামাই ষষ্ঠি ঃঃ—

অভীক বসু

জ্যৈষ্ঠ মাসে কেষ্টখুড়ো যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি
গিলে ধুতি, পাঞ্জাবি আর রঙমাখানো দাড়ি
আমের ঝুড়ি, শয়েক লিচু রসগোল্লার হাড়ি
ইস্টিশনে প্রতীক্ষাতে আসবে কখন গাড়ি,
খুড়োর এখন বয়েস কতো চার-কুড়ি চার হবে
স্বাস্থ্যখানা অটুট খুড়োর দেখার মতো তবে,

শ্বশুর মশাই গেছেন চলে খুড়িও হলেন গত,
জামাই ষষ্ঠি আগের মতোই চলছে অবিরত,
শাশুড়ি আর কতো হবে, নব্বইতো পার
জামাই ষষ্ঠি করতে হবে একটাই আবদার,
সেই কারণেই কেষ্টখুড়োর ষষ্ঠির নেই কামাই
গর্ব করে বলেন খুড়ো একমাত্র জামাই
সাজিয়ে বাটি দেবে খেতে করবে মাথায় হাওয়া
এই বয়েসে জামাই আদর অনেকখানি পাওয়া।

-ঃঃ মূল্যবোধের রূপান্তর ঃঃ-

তুষার পঞ্চানন

বৃটিশ আমলে আমাদের শিশুদের শিক্ষাদানের সময় গোপাল রাখালের উপকথা শেখানো হতো। গোপাল ছিল ভাল ছেলে আর রাখাল ছিল মন্দ, অসৎ এবং চুরি করতো। রাখালের মাসী তাকে প্রশ্রয় দিত। একদিন রাখাল ধরা পড়ে শাস্তিভোগের জন্য কারাগারে প্রেরিত হয়। মাসী তার সঙ্গে সেখানে দেখা করতে গেলে কথা বলার ছলে রাখাল মাসীর কান কামড়ে দিয়ে কেটে নেয়। বলে, মাসী ছোটবেলায় তুমি যদি আমাকে সুশিক্ষা দিতে তাহলে এ দিনটা আর দেখতে হ'তো না। "বর্তমানে অনেকে সবার চোখের সামনে চুরি করছে, ঘুষ খাচ্ছে কিন্তু, তাদের কিছু হয় না, তারা বুক ফুলিয়েই রাস্তার মাঝখান দিয়েই হেঁটে যান। না একটু ভুল বললাম, তারা গাড়ী করেই যান। মাসের পর মাস কেটে যায় তাঁদের কোন শাস্তি হয় না। নূতন ভাবে এখন 'রাজার হস্ত করে সমস্ত, কাঙালের ধন চুরি'।

প্রকৃতির ভারসাম্য যাদের দেখার কথা তারাই দেশের জলাভূমি বুজিয়ে শস্তায় প্লট করে নিজেদের মধ্যেই বন্টন করে নিচ্ছেন। আমাদের দেশকে নিশ্চয়ই এখন আর গরীব দেশ বলা চলে না। আমাদের দেশ এখন প্রথম দিকের উন্নত দেশ গুলির সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলেছে। আমাদের দেশেরই একজন ব্যবসায়ী এখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। যদিও এখানে এখনও মাঝে মাঝেই কৃষকেরা, বেকার ও যুবক আত্মহত্যা করে চলেছে। তবু 'সামনে অচ্ছে দিন হ্যায়' এর তাগিদে নূতন কর ব্যবস্থায় ধনী ব্যক্তিরাই সুবিধা ভোগ করছে। ছাত্রীদের সাইকেল দান করা হচ্ছে, কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য সরকার পুরস্কার পাচ্ছে অথচ দেশে ধর্ষনের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ৫ বছরের শিশু থেকে ৬৪ বছরের বৃদ্ধা কেউ রেহাই পাচ্ছে না। নির্ভয়াদের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করলে শুধু, পার্কস্ট্রীট, কামদুনি বা নানুর সামনে আসে না বরুণ বিশ্বাসের মত শিক্ষকেরা ছবি হয়ে যান। তবু পৃথিবী তো আগের মতোই চলতে থাকে। -

ভোটে জিতে মানুষেরা গরু / ছাগলের মত বিক্রি হয়ে যান। তবু পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা, লোকসভায় কোন হেলদোল নেই। এক দলের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জিত আর একদলে যোগ দিয়ে পদ গ্রহণে কোন লজ্জাও হয় না, পদটাও ছাড়তে হয় না। এই কি গণতন্ত্র! নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ভোটদাতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে রাখালের মত কেউ মাসীর কানটাও কেটে নিতে পারে না। আর যদি দল ধরে বিশ্বাসঘাতকতা করে! এই সেদিন বিধানসভা নির্বাচনে বিহারে কংগ্রেস, আর. জে. ডি. এবং জে. ডি. ইউ নেতা বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট তারা তৈরী করে জয়লাভ করল। আর. জে. ডি. সব চাইতে বেশী আসন পেলেও জে.ডি.ইউ নেতা নীতিশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করেন। তখন কিন্তু নিতীশ কুমার আর. জে. ডি. বা লালুপ্রসাদ দূর্নীতিপরায়ণ বলেন নি। উপরন্ত বিজেপিকে দূর্নীতি পরায়ণ দল বলেছিলেন। জনগণ বিজেপিকে পরাজিত করে মহাজোটকে বিজয়ী করেছিল - এটাই ছিল জানাদেশ। আর এখন হঠাৎ রাতের

অন্ধকারে মন্ত্রীসভাকেও না জানিয়ে বিজেপির সঙ্গে চুক্তি করে মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র রাজ্যপালকে জমা দিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিজেপির সঙ্গে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যপালের কাছে শপথ গ্রহণ করেন।

প্রবীণ জে.ডি. ইউ নেতা শারদ যাদব তীব্র ভাষায় নীতিশ কুমারের এই বিশ্বাস ঘাতকতার নিন্দা করেন। জনাদেশের বিরোধিতা করেই এই নূতন সরকার গঠিত হলো। জনাদেশ, মানবতা ও মূল্যবোধ বিশ্বাস ঘাতকতায় প্রাচীরে মাথাকুটে মরলো। বিচার নেই। যেমন পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জন নির্বাচিত কংগ্রেসী বিধায়ক পদত্যাগ না করেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেস দলনেতা স্পিকারের কাছে প্রতিবাদ জানান এবং আদালতে মামলা করেন। এদের মধ্যেই ছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পি. এ. সির চেয়ারম্যান মানস ভুঞ্যা। তিনি কিন্তু কংগ্রেস সদস্য হিসাবেই চেয়ারম্যান রয়ে গেলেন এবং স্পীকারও স্বীকৃতি দিলেন। এই সেদিন মানস ভুঞ্যা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। আদালত কিন্তু এখনও রায় না দিয়ে বিষয়টি স্পীকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করলেন। এও হয়! হায় গণতন্ত্র! বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা দল বদল করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। ভাবা যায়!

এই সঙ্গে মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় আমরা প্রত্যক্ষ করে চলেছি বিনোদন জগতে। পুলিশ ঘুষ খায় লোকে বলে। টাকার বিনিময়ে ডাক্তার মিথ্যা সার্টিফিকেট লিখে দেয় এসব শুনেছি। কিন্তু টেলিভিসনে সিরিয়ালে যে সব কিছু দেখানো হচ্ছে তা মেনে নেওয়া যায় না। সবার সামনে বড় পুলিশ আধিকারিককে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে তার ইচ্ছা মত টাকার পরিমাণ লিখে নিতে বলা হলো। বিনিময়ে ছেলেকে অভিযোগমুক্ত করতে হবে। ডাক্তার ষড়যন্ত্র ক'রে মানুষ খুন করেছে শুনেছি এও শুনেছি ডাক্তার সুযোগ পেয়ে রোগিনীকে ধর্ষণ করেছে।

কিন্তু টাকার বিনিময়ে কোনরকম অপারেশন না করে সম্পূর্ণ ও সুস্থ এক মানুষকে সারা মাথা ব্যান্ডেজ করে, মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে রিভলভারের গুলি মাথা থেকে বার করা হয়েছে, তিনি অনেকদিন কথা বলতে পারবেন না। ডাক্তারদের তিনটি ইউনিয়ন আছে। কেউ এই ঘটনার প্রতিবাদ করলো না! মানুষ এদের সম্বন্ধে কি ভাববেন! হায় মূল্যবোধ! সেন্সর বোর্ডও নীরব থাকলো।

এবারে রাজনৈতিক দলের মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। নির্বাচকমন্ডলী তথা সাধারণ মানুষ কর্মসূচী ও মতাদর্শ বিবেচনা করেই কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দলগুলি তাদের মতাদর্শ ও কর্মসূচী প্রকাশ করে। যে কোন নির্বাচনের সময় তারা পৃথক ভাবে তাদের ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে। তখন ম্যানিফেস্টো দ্বারাই মানুষ প্রভাবিত হয়। তারা দল তথা প্রার্থীকে ভোট দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রার্থী তথা দলও নির্বাচিত হয়

ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী কাজ করতে থাকে। এটাই স্বাভাবিক এবং কাম্য। সেজন্যই কোন কোন দেশের সংবিধানে 'রিকল' বা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা আছে। কোন বিজয়ী প্রার্থী নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো বিরোধী কাজ করলে সংবিধান নির্দেশিত কিছু সংখ্যক ভোটার 'রিকল' এর আবেদন জানালে সেই বিজয়ী প্রার্থীকে আবার নির্বাচনের সম্মুখীন হ'তে হ'তো। ভারতের সংবিধান এই ধারা সন্নিবিষ্ট থাকলে বিহারে জে.ডি. ইউ বিজয়ী প্রার্থীদের আবার জনাদেশ নিতে বাধ্য করা যেতো। পশ্চিমবঙ্গে তো কথাই নেই। পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভায় পেশী শক্তির জোরে দলবদল ঘটানো হয়েছে। এই জে. ডি. ইউ- টি. এম. সি প্রমুখ দলের কোন মূল্যবোধই নেই।

আবার কিছু রাজনৈতিক দল আছে যারা নমনিয়তা, সমন্বয়, বাস্তবতা ইত্যাদি শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে চায় না। তাদের মূল্যবোধের অভাব আছে কখনও বলা যাবে না। কিন্তু সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতার অভাব কোন কোন কাজে অবশ্যই প্রকট হয়ে পড়ে। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসীতে অংশগ্রহণ করলে সেই মতই চলতে হবে। মতাদর্শের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সময় যা প্রত্যাশা করে তার উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জানতে হবে। তা না হলে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে যৌথ আন্দোলন থেকে যুক্তফ্রন্ট হয়ে বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, স্বৈরতন্ত্র বিরোধী, ধর্ম নিরপেক্ষ বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গড়ে তুলতেই হবে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও যখন শুনতে হয় - ''আমি জমিন ভরে সোনা ফলাই, তবুও ঘরে আমার খিদের আগুন কেন নেভেনা, বলে দাও বিচার করে তোমরা পাঁচজনা। আমার ভাঙ্গা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে ঐ অবোধ শিশু, কাঁদে হায় খিদের জ্বালায়, তবু তার ছোট্ট মুখে তবু একফোটা দুধ কেন জোটে না ... তখন বড়ই লজ্জা লাগে। একই দেশে সবচেয়ে বড় ধনী আর না খেতে পাওয়া গরীব। হায়।

স্বাধীনতার সময় কত সম্পদ ছিল এখন কত, কিভাবে হ'ল কখনও দেখা হয়েছে? বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ' পাঁচ বছরে তিনশো গুণ সম্পদ বাড়িয়েছেন, কিভাবে? দেখা হবে কি?

Vol : VI Issue : VII,14th October, 2017 আশ্বিন, ১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য"

গৌতম রায়চৌধুরী

এক চরম সংকটকাল উপস্থিত। গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ রাতে নিজের বাড়িতে খুন হয়ে গেলেন সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ। অপরাধ? মুক্ত চিন্তা বর্তমান শাসকদলের ভন্ড এবং উগ্র হিন্দুত্বের, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধীতা। ২০১৩র ২৫শে অগাষ্টে মহারাষ্ট্রের কুসংস্কার বিরোধী, যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকারকে পুনেতে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছিল। খুনীরা এখনো অধরা।এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা ২০১৫-র ২০ ফেব্রুয়ারী কোলাপুরে খুন করল দাভোলকারের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আপোশহীন লড়াকু, মহারাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট নেতা গোবিন্দ পানেসরকে। অপরাধ? শিবাজীর তথ্যনিষ্ঠ নব্য মূল্যায়ন। ঐ বছরই ৩০ অগাষ্ট কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে হত্যা করা হল কর্নাটকের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হাম্পির কানাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. এম. এস. কলবুর্গিকে। অপরাধ? 'নগ্ন দেবতার উপাসনা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়" — এই মতে অনড় থাকা। দিল্লি থেকে মাত্র তিরিশ কিলোমিটার দূরে উ.প্রদেশের দাদরির বিশাখা গ্রামে মহম্মদ আসলাসকে প্রতিবেশীরা নৃসংশভাবে মারল। অপরাধ? বাড়ির রেফ্রিজারেটরে গো-মাংস সংরক্ষণ। প্রশাসন ব্যস্ত ফরেনসিক পরীক্ষায়। না - না খুনীর হাতের ছাপ নয়, রেফ্রিজারেটরের মাংসের ফরেনসিক পরীক্ষায়! বর্ণিত ঘটনাগুলি সংবাদ মাধ্যমে বহু আলোচিত। আরও অজস্র ঘটনা- আমাদের রাজ্যে, দেশের উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে - কখনও গোরক্ষার নামে কখনও বা ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাসের বা পছন্দের সঙ্গী নির্বাচনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তির আক্রমণ ঘটেই চলেছে।

বর্তমান শাসকদলের তাত্ত্বিক নেতারা হিন্দুত্বের নব্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। "সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের" তত্ত্ব নতুন করে সামনে আনছেন। তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় বলতে বোঝায় শুধু হিন্দুদেরই। আমরা যারা মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী, ভারতের বহুত্ববাদে, ধর্ম - জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে সাম্যে বিশ্বাসী তারা বড় অসহায় বোধ করছি। আমরা অসহায় বোধ করলেও, এই তত্ত্বের অসারতা উপলব্ধি করতে পারি। কারণ? বিবেকানন্দ তাঁর প্রচারিত 'নব বেদান্ত', যাকে তিনি ১৮৯৩-র শিকাগো ধর্মসভায় উপস্থাপিত করেছিলেন 'সার্বজনীন ধর্ম' হিসাবে, তা এই আগ্রাসী অসহিষ্ণু 'হিন্দুত্বে'র তত্ত্বগতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। এই সংকটকালে সেই চর্চা হয়তো পথ দেখাবে।

মুক্ত চিন্তা

এক অশান্ত তরুণ, ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি, ব্রাহ্মসঙ্গীতে পারদর্শী কিন্তু ঠাকুর পরিবারের সান্নিধ্যও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। অথচ এক গৃহী, আনুষ্ঠানিক ডিগ্রীহীন কালি মন্দিরের এক পূজারী তাকে

আকৃষ্ট করেছিল। কারণ শ্রী রামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ"। এই পথই তার পাথেয়। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, শিকাগো ধর্মসভায় বললেন" আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীদের মত সহ্য করি, তাহা নহে - সকল ধর্মকেই আমরা মনে প্রাণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।" নিবেদিতার স্মৃতিচারণা থেকে আনতে পারি যে কাশ্মীর ভ্রমণের সময় বিবেকানন্দ নৌকার মুসলমান মাঝির শিশুকন্যাকে উমারূপে পূজা করেছিলেন (আগষ্ট ১৮৯৮)। হিন্দু- মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে হয়তো তাঁর রচনায় বিশদ আলোচনা নেই, কিন্তু ১৮৯৮ সালের ১০ নভেম্বর, আলমোরা থেকে নৈনীতালস্থিত জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে প্রেরিত চিঠির বক্তব্য থেকেই তার মতবাদ আমরা অনুভব করতে পারি। তিনি লিখলেন "আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই। আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মরূপ এই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা" (এস, মানুষ হও)। তিনি ছিলেন মুক্ত চিন্তার পূজারী। শিষ্যদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কখনো তাদের ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু বা স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব করবার চেষ্টা করতেন না। তিনি বলতেন একটা বড় গাছের ছায়ায় অন্য একটা বড় গাছ কখনো বাড়তে পারে না। বর্তমানের নেতারা স্বাধীন চিন্তা বরদাস্তই করতে পারে না। আর বিবেকানন্দের মতে "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা আবশ্যক, তেমনি তাহার, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন, যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে" (এস, মানুষ হও)। তিনি মিশন পরিচালিত অনাথাশ্রমে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের লোককে আসন দিতে বলতেন, কিন্তু সঙ্গে সতর্কবার্তাও দিতেন (১০.১০.১৯৯৭) "ধর্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া দাওয়া অলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ মনুষ্যশালী এবং পরহিতকরও হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম-"

খাদ্যাভ্যাস - আমিষ/ নিরামিষ

বিবেকানন্দের কাছে ধর্মের সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের কোন সম্পর্কই ছিল না। এখানকার নব্য তাত্ত্বিকরা তথাকথিত নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণ বা শুধুমাত্র বাড়িতে রাখার অভিযোগে মানুষ খুন করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। অথচ বিবেকানন্দ বললেন "হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ। ... জীব হত্যা পাপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তবে যতদিন রাসায়নিক উন্নতির দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি মনুষ্য শরীরের উপযোগী খাদ্য না হয়, ততদিন মাংসভোজন ভিন্ন উপায় নাই" (এস, মানুষ হও) আরো স্পষ্ট করে বললেন —"ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। এখানকার হিঁদুর ধর্ম বিচার মার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয় - ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। (এস, মানুষ হও)। তিনি মাংসাহার নিয়ে আরো বললেন "ক্ষত্রিয়েরা মাংস খাক আর নাই খাক, তারাই হিন্দুধর্মের ভিতর যা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিস রয়েছে, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিলেন কারা? রাম কি ছিলেন"? (এস, মানুষ হও) কী সাংঘাতিক

কথা? পরমারাধ্য রাম মাংসাশী। নব্য হিন্দু তাত্ত্বিকরা যতই বলুক, গোরুকে তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার করুক, প্রকৃতপক্ষে গোমাংস খাওয়ার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই, প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণরাও গোরুর মাংস সাগ্রহে ভক্ষণ করতেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, তুমি আমার জন্য পণের কুড়িটি বৃষ রান্না করে দাও, আমি তা খেয়ে আমার উদরের দুদিক পূর্ণ করি। রামায়ণ -এ বন গমনের পথে ভরদ্বাজ মুনি রাম, সীতা, লক্ষ্মণকে বৃষ এবং ফলমূল দিয়ে আপ্যায়ণ করেছিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ, ২।৪৫) মহাভারতেও গোমাংস ভক্ষণের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। পরবর্তীকালে, সমাজের প্রধান জীবিকা যখন পশুপালন থেকে কৃষিতে রূপান্তরিত হল — তখন পশু মাংসের বিকল্প হিসাবে তন্ডুল জাতীয় খাদ্যের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হল এবং চাষের জন্য গবাদি পশুর চাহিদা বাড়ল। স্বভাবতই গোমাংস ভক্ষণ ও গোহত্যা নিষিদ্ধ হল। এর মূল কারণ ধর্মীয় নয়, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক কারণেই গোমাংস ভক্ষণ চালু রাখা প্রয়োজন। যান্ত্রীকরণের ফলে কৃষিকাজে ষাড়ের ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে। ১৪ - ১৫ বছর পর অর্থাৎ দুধ দেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর উদ্বৃত্ত গোরুগুলি'ত কৃষকের বোঝা। ফলে বেওয়ারিশ ষাড়ের মত বেওয়ারিশ গোরুগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঠের ফসল নষ্ট করছে এবং অখাদ্য- কুখাদ্য খেয়ে মরছে। আর গোমাংস খেতে অভ্যস্ত দেশের চল্লিশ ভাগ মানুষ সস্তা প্রোটিনের অভাবে ধুঁকছে। অনেকেই বলবেন কেন গোশালা আছে। সেখানে উদ্বৃত্ত গবাদি পশুরা থাকবে। কিন্তু বাস্তবে দেশের প্রায় ৩০ কোটি গবাদি (২০ কোটি গরু এবং ১০ কোটি মোষ) পশুর জন্য মাত্র চার হাজার গোশালা আছে, যেখানে সর্বাধিক ৪০ লক্ষ পশু থাকতে পারে। বাকীরা? গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত গোশালা গুলি আগাগোড়া দুর্নীতিতে আক্রান্ত। তাই বর্তমানে গো-রক্ষা নিয়ে মাতামাতি বা গোমাংস ভক্ষণের অভিযোগে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর ক্রমাগত আক্রমণের মূল কারণ ধর্ম নয়, অর্থনীতি নয় - শুধুমাত্র রাজনীতি - না তাও নয় সংকীর্ণ রাজনীতি।

গোরক্ষা

অবশেষে আশ্রয় নেবো, আবার বিবেকানন্দের ঘটনাটি 'স্বামী শিষ্য সংবাদে' লিপিবদ্ধ। স্থান কলকাতার বাগবাজার এবং সময় - ১৮৯৭ এর ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে। উল্লিখিত দিনে ' গোরক্ষিনী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। .. ইহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো - মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধা। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন যে তাদের সভার উদ্দেশ্যে হচ্ছে দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। বিভিন্ন স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করে রুগ্ন, অকর্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত থেকে ক্রীত গোমাতাদের পালন করা। আরো জানালেন মারোয়াড়ী বণিক সম্প্রদায় তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তৎকালে মধ্যভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করে স্বামীজী তাদের সভাকে সাহায্য করতে বলাতে প্রচারক জানালেন যে কেবল গোমাতাদের রক্ষাকল্পেই তাদের সভা স্থাপিত এবং তারা দুর্ভিক্ষে সাহায্য করে না। এই যুক্তিতে স্বামীজীর ক্রোধ এবং তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গ এখনও প্রাসঙ্গিক। "যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না; নিজের ভাই অনশনে

মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য একমুষ্ঠি অন্ন না দিয়ে পশু-পক্ষী রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তার সঙ্গে কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই, তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় বলে আমার বিশ্বাস নেই।'' স্বামীজীর গঞ্জনায় অপ্রতিভ হয়েও প্রচারক বললেন - ''.... কিন্তু শাস্ত্র বলে - গরু আমাদের মতো'', ''স্বামীজী (হাসিতে হাসিতে) হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি — তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?''

এই ব্যঙ্গ - বিদ্রুপের সাহায্যে কষাঘাত করার ক্ষমতা আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাইতো আমরা শান্ত মনে সহ্য করছি স্বামী বিবেকানন্দ এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়কে একাসনে বসাবার অপচেষ্টা। উপলক্ষ? স্বামীজীর বিখ্যাত শিকাগো বক্তৃতার ১২৫তম বার্ষিকী এবং দীনদয়ালের ১৩০ তম জন্মোৎসব। ধর্মের এই রাজনীতিকরণের বিরুদ্ধে আমাদেরই সোচ্চার হতে হবে। শুধু ভারত নয় - এই বিপদ আজ দিকে দিকে উঁকি মারছে। সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দেশ মায়ানমারে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। মধ্য প্রাচ্যে ধর্মের মিলিটারিকরণের মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছে আল কায়েদা বা ইসলামিক স্টেট। ভারতেও সহজ - সরল সনাতন হিন্দু ধর্মের জায়গা নিতে চলেছে উগ্র হিন্দুত্ব। আমরা যারা মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী তাদেরই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সেই লড়াইয়ে সঙ্গী হবে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং অবশ্যই মার্কসীয় দর্শন।

''চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত,

* * *

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোত পথ ফেলে নাই গ্রাসি —

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত,''

Vol : VI Issue : VII,14th October, 2017 আশ্বিন, ১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

।। মাদার টেরিজা স্মরণে ।।

অশোক রঞ্জন ধর

"The fruit of silence is prayer,
The fruit of prayer is faith,
The fruit of faith is love,
The fruit of love is service,
The fruit of service is peace,"

Mother Teresa

মাদার টেরিজার জন্ম হয় ১৯১০ সালের ১৬ই আগষ্ট সার্বিয়া আলবেনিয়া অঞ্চলের স্কোপজী শহরে এক আলবেনিয়ান পরিবারে। তার বাল্যকালের নাম আগ্নেস গন্জে বোয়াজিউ। পিতার নাম নিকোলা বোয়াজিউ এবং মায়ের নাম দ্রানাফিলি। তিনি ছিলেন পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান। ছোট থেকেই তিনি মিশনারীদের জীবনী এবং বঙ্গদেশে তাদের কাজের বিষয় জানতে আগ্রহী ছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে তিনি ঠিককরেন যে ভবিষ্যতে তিনি ধার্মিক জীবন যাপন করবেন এবং 'নান' হবেন।

লোরেটো অর্ডারে যোগদানের জন্য মাদার সুপিরিয়রকে ২৮শে জুন, ১৯২৮ আবেদনে তিনি লেখেন - ''আমি হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পাশ করেছি। ভাষার মধ্যে আমি জানি আমার মাতৃভাষা আলবেনীয় এবং সার্বিয়। কিছুটা ফরাসী জানি। কিন্তু ইংরাজী একদমই না। কিন্তু আশা রাখি দয়াময় প্রভু আমার ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করবেন তাই এক্ষনি নেমে পড়েছি ওই ভাষাটা শেখার কাজে''। অল্পকালের মধ্যেই মাদার ইংরেজী রপ্ত করেন। লরেটো সিস্টার্স এ যোগ দিতে ১৯২৮ সালে আয়ারল্যান্ডে যান। এরপর মায়ের সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি। সেখান থেকে 'মার্চা' নামক জাহাজে ১ ডিসেম্বর, ১৯২৮ তিনি ভারত অভিমুখে রওনা দেন, পাঁচ সপ্তাহের জলযাত্রা। জাহাজে তিনি একটি কবিতা লেখেন। তার কিছু অংশ —

''ছেড়ে যাচ্ছি প্রিয় ঘর
প্রিয় দেশ
চলেছি সুদুর বাংলার
তপ্ত প্রদেশ

ছেড়ে যাচ্ছি পুরনো মিত্র,
পরিবার, বাড়ি
প্রাণ চায় ডুবে যাই
সেবাকর্মে তাঁরই।''

যাত্রাশেষে জাহাজ কলকাতা বন্দরে পৌছাল ৬ জানুয়ারী, ১৯২৯। দার্জিলিং এ তাঁর শিক্ষানবিশী শুরু হয়। ২৪শে মে, ১৯৩১ অ্যাগনেস লরেটো অর্ডারের 'নান' হিসেবে দারিদ্র, কৌমার্য ও আনুগত্যের প্রথম 'ভাউ' নেন। তিনি সন্ন্যাসিনী রূপে স্বীকৃত হন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি ভূমিতে মুখ স্পর্শ করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েন। যা হল মৃত্যুর প্রতীকী। অর্থ হল জাগতিক সংসার ছেড়ে আধ্যাত্বিক জগতে প্রবেশ করা এবং প্রভু জিসাস ক্রাইষ্টের কোলে আশ্রয় নেওয়া। সেদিন থেকে তাঁর নাম হয় 'সিস্টার মেরি টেরিজা অব্ চাইল্ড জিসাস'।

১৯৩১ সালের জুন মাসে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সেখানে এন্টালীতে লোরেটো স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশেপাশের বস্তির গরীবদের মধ্যে কাজ শুরু করেন।

১৯৩৭ সালের ১৪ জুলাই দার্জিলিংএর লরেটো কনভেন্টে তিনি 'নান' হিসাবে শেষ' ভাউ' বা শপথ নেন। তখন থেকে তিনি 'মাদার' মাদার টেরিজা। কলকাতায় ফিরে মাদার টেরিজার প্রথম কাজ হল এন্টালির সেইন্ট মেরিস স্কুলের প্রিন্সিপালের সহকারীর দায়িত্ব নেওয়া।

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬।অ্যাম্বায়াল রিট্রিটে রেলে করে যাচ্ছিলেন দার্জিলিংএর লোরেটো কনভেন্টে। ট্রেনের ভেতর থেকে এক ডাক (The call within a call) পান আসলে যিশুরই কণ্ঠধ্বনি। ''শুনলেন, তুমি সব কিছু ছেড়ে গরিবদের মধ্যে চলে যাও। ... যারা রিক্ত, আশ্রয়হীন ও মুমূর্ষু তাদের আহার, পথ্য ও আশ্রয় দিয়েই তুমি আমার প্রিয় কাজ সাধন করবে।'' পরবর্তীকালে এই দিনটিকে তিনি Inspireation day হিসাবে পালন করতেন।

৮ আগষ্ট ১৯৪৮ সালে মাদার পোপের সম্মতি পান লোরেটো অর্ডারের বাইরে পৃথক ভাবে কাজ করতে। প্রতিষ্ঠা করেন মিশনারিজ অব্ চ্যারিটি। ১৬ আগষ্ট নীল পাড় সাদা শাড়ী পরে তিনি পাটনা যান নার্সিং ট্রেনিং নিতে। ৮ ডিসেম্বর পাটনা থেকে রওনা দেন। সঙ্গে পাঁচটাকা ও তিনটি শাড়ী। ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৮ কোলকাতার মোতিঝিল বস্তীতে আরম্ভ করেন সেবাব্রত। প্রতিষ্ঠা করেন আশ্রয়হীন মৃত্যুপথ যাত্রীদের জন্য 'নির্মল হৃদয়', শিশুদের জন্য নির্মল শিশু ভবন, কুষ্ঠ রোগীদের জন্য কুষ্ঠাশ্রম। তাঁর সেবাব্রত ক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বিশ্বের ১৩৩টি দেশে ৪৭১০ জন সন্ন্যাসিনী ৪৭০টি কেন্দ্রে সেবাব্রত চালাচ্ছেন। আমরা গর্বিত যে মাদার ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ভারত রত্ন, ম্যাগাসেসে পুরস্কার, নোবেল শান্তি পুরস্কার সহ নানা সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

মাদার হাউজে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। তিনি বুঝলেন যে তাঁর বাঁচার শক্তি নিঃশেষিত প্রায়। সিস্টার ডরোথিকে বলেন, "Jesus wants me and I will go to him". ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার মাদার অমৃত লোকে চলে গেলেন। মৃত্যুকালে শুধু বললেন "Jesus I Love you, Jesus Love you"

তাঁর মৃত্যুর ১৯ বছর পর রোমান ক্যাথলিক চার্চ ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তাঁকে 'সন্ত' (সেইন্ট) রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি এখন সারা বিশ্বের 'মা' —— ''সন্ত মাদার টেরিজা অব্ কলকাতা' বিশ্ববরেণ্য মা'কে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

-ঃঃ সমান সমান ঃঃ-

ছায়া মুখোপাধ্যায়

গণিতে একটা পদ্ধতি সমান সমান শব্দটার সঙ্গে প্রায় সব মানুষেরই একটা সুপরিচিত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু জীবনের অঙ্কের সঙ্গে বোধ হয় তা একেবারেই সঙ্গতি বিহীন। বাস্তবে সংখ্যাতত্ত্বে দুইয়ে দুইয়ে চারই হয়। আবার প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও আছে। প্রকৃত অধ্যাবসায় থাকলে তার প্রতিষ্ঠাও আছে। নিরলস চেষ্টা থাকলে উপায়ও থাকে।

এবার আসি আমার একটা স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সকলের সঙ্গে একিভূত হতে চাইছি। আজকাল খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই চোখে পড়ে নারী-পুরুষ সমান সমান। দূরদর্শনের বোতাম টিপলেই বিজ্ঞাপনের প্রচারেও নারী পুরুষ সমান সমান এছাড়া বিদ্যালয়ে, উচ্চবিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে এমন কি সরকারী অইনেও নারী পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। অফিসে - আদালতে এমন কি নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করার অধিকার নারীর রয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও নারী, পুরুষ সমান হতে পেরেছে কী ? কী করে তা সম্ভব? গণিতেই তা সম্ভব। আমরা ঘুম থেকে উঠেই যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই তাহলেই দেখতে পাবো যে সূর্যের আকার ও উত্থান প্রতিদিন একরকম ও একই স্থানে হয় না। আবার একটা গাছের দিকে তাকালে তো দেখি যে কোন পাতার অন্য পাতার হুবহু মিল নেই। ফলের ও ফুলের ক্ষেত্রে ও তাই হয়। বাবা - মায়ের দুই সন্তানের মধ্যেও তো সমান সমান থাকে না। প্রকৃত গতভাবে সৃষ্ট এই নারী পুরুষ সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন প্রকৃতিও আকৃতি নিয়ে জন্মেছে।

রবীন্দ্রনাথের কথায় "সম্মানে সম্পদে পার্শ্বে রাখো মোরে" এটা যেমন সত্য। তেমনই সত্য সামাজিক আধিকারগুলি প্রাপ্যর থেকে সমানাধিকার পাওয়া এবং কেউ কাউকে আহত ও প্রতিহত না করে স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগিতায় নিরপেক্ষভাবে নিজের অধিকার লাভে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একমাত্র কাম্য।

—ঃঃ মানবী ঃঃ—

পুষ্পিতা সেনগুপ্ত

আমার জন্য তো দুজনেই সমান,
সে যেই রাজা হোক,
কোনো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বা নবাধাম দুর্যোধন,
আমি তো থেকে যাব সেই একা অনাবৃত।
এক যুদ্ধ থেকে যাব আরেক যুদ্ধে
পাব নতুন শত্রু বা চির সখা বন্ধু,
এ যুদ্ধে নেই কোনো জয়ী পরাজয়ী
বিষাদের ভারে বসে থাকি একা আমি
সত্য কি তা জানে শুধু আমার ঈশ্বর
দু পক্ষের শোকেই আমি ফেলেছি অশ্রুজল
আমি আমারই মতো কোনো প্রেমিক,
জায়া, মাতা, ভাসছে, চোখের জলে,
অবিরত, প্রতিপলে, প্রতিদিনে
এরা আমার আত্মস্বরূপিনী
শতরূপের আড়ালে দাঁড়িয়ে মানবী
ভাঙা হৃদয়ে যে আজও বলতে পারে,
আমি ভালোবাসতে জানি, আমি
ভালবেসেছি।।

—

—ঃঃ দেশান্তর ঃঃ—

সুমিত্রা গুপ্ত

কোন এক অন্য দেশে যাব ভেসে
হাসি-কান্না, সুখ দুঃখের
নেই হিসেব যেই দেশে -
তুচ্ছ মায়া, তুচ্ছ কায়া
ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে
ঝড় হয়ে বইব আমি
বৃষ্টি হয়ে ঝরব আমি,
চাঁদের আলোয় ভাসব আমি
ধ্রুবতারার বেশে,
রামধনুর দেশে।
যখন তোমরা তো আর
আমার পাশে
রইবে নাকো অবশেষে
ডাকবে আমার নামটি ধরে
রইব চেয়ে হেসে হেসে।

—

—ঃঃ কম ঃ অম্বর রায় চৌধুরী স্মরণে ঃঃ—

প্রশান্ত কুমার ধর

হে! বীর সৈনিক চলে গেলে উড়ে, সকলের হৃদয় শূন্য করে,
দূর দূরান্তে, কোন এক অজানা শান্তির নীড়ে,
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মনে, শক্তি হারায় সহিবার,
পাবোনা দেখতে আর, ভুলিতে নাহি পারি তোমায়।

হারালাম মোরা এমন এক সংগ্রামী সৈনিককে,
যাঁর বিচরণ ছিল বহুকর্মক্ষেত্রে,
সাফল্যের সাথে করেছেন পালন,
সততা নিষ্ঠার শক্তি নিয়ে।

কর্তব্যে কঠিন, দায়িত্বে ছিলেন অবিচল,
কথায় শান, সিদ্ধান্তে দৃঢ়, স্মরণে তীক্ষ্ণ,
কথায় ছিল সতর্কীকরণ, নিপূণ স্বাভাবিকতা,
চলা-ফেরায় অতি নম্র, অতি সাধারণ।

কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন নিজেকে,
যোগ্যতা বলে পেয়েছেন, গুরু দায়িত্ব অনেক সংস্থার,
কর্মভারে এতটুকু ছিলোনা কখনো শৈথিল্য
সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে গেছেন, পেয়েছেন যোগ্য সম্মান।

করেছ লড়াই জীবনে অনেক,
করনি আপস, অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে,
পিছু হটার মন্ত্র ছিল না তোমার মনে,
করেছ জয়, এনেছ শান্তি, প্রশংসার পঞ্চমুখে।

কাজের মধ্যে, সকলের হৃদয়ে
দখল করেছিলে অনেক জায়গা,
যে দিকে তাকাই, আসে ভেসে, তোমারই মুখ বারবার,
আজ তুমি সকলের সাথে, ছায়ার মতো সন্তর্পণে।

হে! দীপ্তময়, তুমি থাকবে অমর হয়ে,
মোদের প্রাণের মাঝে,
আলো দেখাবে, পথ দেখাবে,
মোদের কাজের মাঝে।

—

—ঃঃ সার্থক জনম আমারঃঃ—

মৃণাল দত্ত

সরকারের নির্মাণ বিভাগ
হাসপাতালের চতুর্দিকে
গোশালা বানাচ্ছে
শ্বেতপাথরে মোড়া।
এখানে গরু রাখা হবে।
শ্বাসকষ্টে অসুস্থদের সতর্ক পাহারায়
গরুরা এখানে অক্সিজেন দিয়ে যাবে
চব্বিশ ঘন্টা
সারা মাস
সারা বছর
হাসপাতালে অক্সিজেন নেই
শিশুরা মারা যাচ্ছে
প্রসূতিরা অসুস্থ হচ্ছে

অথচ
গরুগুলি চারিদিকে
অক্সিজেন ছড়াচ্ছে
বিনা ক্লেশে
অবিরত।
তাদের নিঃশ্বাস গ্রহণে বর্জনে
শুধুই অক্সিজেন আর অক্সিজেন
সুতরাং
সতর্ক গোশালা হাসপাতালে
সব বেড়ে পাইপ লাইনে
অব্যাহত অক্সিজেন
গরুরা স্বচ্ছন্দ্যে আছে
খাদ্য পানীয়ের ঘাটতি নেই।
তারা একসুরে ঐক্যের গান গাইছে
সার্থক জনম আমার এই দেশে।।

—

Vol : VI Issue : VII,14th October, 2017 PRABIN BARTA Postal Regd NO. Kol/ RMS. 449 / 2016 - 2018

আনন্দ সংবাদ / একটি আবেদন

সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার দ্বাদশ বর্ষে আমরা ৯০/১ প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোডস্থিত জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ এর ভবনে মোট ২,২২২ স্কোয়ার ফুট জায়গা ৯০০ বছরের জন্য লিজ নিয়েছি। এজন্য মোট তিন কিস্তিতে ৪১ লক্ষ টাকা সংস্থার তহবিল থেকে জয় কো-অপারেটিভকে দিতে হয়েছে, সেইজন্য আমাদের আর্থিক অনটনের মধ্যে চলতে হচ্ছে। স্বল্পসময়ের নোটিশে লেনদেন হওয়ায় আমরা সুপরিকল্পনা করতে পারিনি।

এ বাড়িটি পাওয়ার সাথে সাথে সংস্থার নিজস্ব একটি জায়গা হল। কাজেই আমাদের স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্লিনিক ও অন্যান্য কাজকর্ম চালাতে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। এজন্য আমরা আমাদের সকল সভ্য-দরদীদের নিকট বেথুনের তহবিলে দান করার জন্য আহ্বান করছি।

আশাকরি, এই আনন্দ সংবাদ জানার সাথে সাথে অতীতের মতোই আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনাদের সহৃদয় দানে এই সংস্থার তহবিলকে পূর্ণ করে তুলবেন।

পেলব মুখার্জী
সভাপতি

দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in